"Oh! My River (2) Teesta" – Teesta epic writer Debesh Roy had a poetic review of a detailed poetry on lens by Samita and Utpal Chowdhury on the beautiful, majestic and the most important river of Sikkim and Darjeeling Hills and the entire North Bengal stretching up to Northern Districts of Bangladesh underneath a pathos of a girl child Teesta.

ভৌগোলিক নদী নয়, এ তো মানুষের নদী

দেবেশ রায়

একটা এমন ব্যক্তিগত বিষাদ বেয়ে এই বিরল আশ্চর্য বইটার কাছে পৌঁছলাম যে বিষাদকে গত প্রায় চল্লিশ বছরের চেষ্টাতেও সামূহিক করে উঠতে পারলাম না।

শেষ শীতে জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম। শিলিগুড়িও। তরুণ বন্ধুদের জেদে গাজোলডোবায় যেতে হয়েছিল। বন্ধুরা বলছিলেন— তিস্তা ব্যারাজ কর্পোরেট হয়ে যাচ্ছে, যেতেই হবে। তিস্তা ব্যারাজ আমার কাছে আমার জীবনের অর্ধেকটা জুড়ে দুঃস্বপ্ন। কাউকে কিছুই বোঝাতে পারিনি। একই স্বেচ্ছাবৃত বধিরতায় বামফ্রন্ট সরকার ও তৃণমূলের সরকার আক্রান্ত। পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ নদীকে হত্যা করা হচ্ছে। এ বার গিয়েও সেই একই দৃশ্য, ট্র্যাজেডির। তিস্তার মূল খাত শুকনো, নানা রঙের বালির বিস্তার, কিছু বালিয়াড়িও দেখা যাচ্ছে। আর, তিস্তার জল ব্যারাজ থেকে তিস্তা ক্যানাল দিয়ে বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে ক্যানালের ওপরে একটা পাখিও উড়ছে না। তার বাঁধানো পাড়ে বিদেশি ঝাউগাছ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৃষ্টিচ্ছায় অরণ্য দিয়ে যে নদী নেমে এসেছে, তাকে বাঁধানো ক্যানালের দৃষ্টিশোভন ঝাউ গাছের সারি দিয়ে সাজানো। হায় রে উন্নয়নের বোধ! হায় রে সৌন্দর্য সংহার!

আরও প্রহসন, ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে জায়গাটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য তিস্তার জল থেকে আলাদা করে পুকুর খোঁড়া হয়েছে। সেখানে বোটিং হবে। হোটেলগুলির জন্য জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেগুলো যে কতই মনোহারি হবে, তার সংকেত হিসেবে প্রধান রাস্তা থেকে ওই জমিগুলোতে যাওয়ার পথ ছোট-ছোট ঝোপের সারি দিয়ে সাজানো হয়েছে। হায় রে অন্ধতা! ট্যুরিজম মানেই বানানো লেকে বানানো নৌকাবিহার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক নদীকে উপেক্ষা করে তার পাশে পুকুর কাটা হয়েছে।

এর ফলে যা অবধারিত, তা-ই ঘটছে। ভারতের পর্যটন শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল, এই শিল্পের প্রধান নির্ভর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পর্যটকরা। তাই, তিস্তা ব্যারাজের কাছে বেসরকারি জমির কালোবাজারি শুরু হয়ে গেছে। ২৮ ও ২৯ জুন উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, গাজোলডোবায় জমি নিয়ে কালোবাজারি সরকার সহ্য করবে না।

এই ব্যক্তিগত বিষণ্ণতার মধ্যে কলকাতা বইমেলা থেকে বন্ধু কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য— তিনিও তিস্তাসন্ততি— একটা বই এনে মধ্যরাতে আমাকে দিয়ে চলে গেলেন। *আন্ড দ্য তিস্তা ফ্লোজ*। সেই বিরল আশ্চর্য নদীকথা সেই রাত থেকে আমার সঙ্গী। ব্যক্তিগত আখ্যান মিশে গিয়েছে নিসর্গের এক সনাতন বাস্তবে, পর্বতারোহণের অভিযান হয়ে উঠেছে গভীরতম নিঃসঙ্গ আত্মসন্ধান, সন্ধানের নিরবয়ব আবেগ থেকে তৈরি হয়েছে নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোকচিত্র তোলার নিখুঁত অভিনিবেশ।

লেখক ও চিত্রগ্রাহক দম্পতি শমিতা ও উৎপল চৌধুরী উত্তর সিকিমের ১৭,২১০ ফুট থেকে ২৫০ ফুট উঁচুতে ভারতের উচ্চতম যুগলহ্রদ ও তারও উপরের হিমবাহ থেকে তিস্তার গতিপথ ধরে ধরে ৪১৬ কিলোমিটার নেমে এসেছেন রংপুরের তিস্তামুখঘাটে। সেখানেই তিস্তা ব্রহ্মপুত্রে মেশে। এই তিস্তাবতরণ তাঁরা এক বার মাত্র করেননি, ন'বার করেছেন। কেন, সে কথা এই লেখার শেষে বলব।

তাঁদের এই তিস্তাবতরণের কাহিনি এই ১৮৬ পৃষ্ঠার সাড়ে ২৩ সেন্টিমিটার চৌকো বইটিতে বলা হয়েছে, এই ৪১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ তিস্তা অববাহিকার ও জনপদের ফটো বিবরণ-সহ। মোট ছবি আছে ১৬৯টি, নানা আকারের ও সঙ্গে আছে সেই ছবিগুলির গল্প। ১৭টি জোড়াপাতা আছে— শব্দহীন ছবি। সে তুলনায় ছবিহীন জোড়াপাতার সংখ্যা মাত্রই ১। তাতে মনে হয়, আন্তর্জাতিক বইয়ের বাজারে প্রকাশক একটি এমন বই তৈরি করে তুলতে চেয়েছেন, যাকে বই-ব্যবসার মহলে 'কফি-টেবল' বই বলা হয়ে থাকে। এমন উদ্যম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়— এমন চিত্রল ও সবাক বইয়ের গ্রহণীয় একটি উপস্থাপন। কিন্তু এমন উদ্যম বইটির ভিতরটাকে অনেক সময় ঢেকে ফেলতে পারে। এই বইটিতে তেমনটা ঘটেনি বলেই বইটিকে বিরল আশ্চর্য বলেছি।

শমিতা ও উৎপল চৌধুরী স্বেচ্ছায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন, ফার্মেসিবিজ্ঞান সম্পর্কিত পেশার বাইরে, উচ্চ পর্বতারোহণে ও ফোটোগ্রাফিতে। বাংলা, সিকিম, নেপাল, কুমায়ুন ও গাড়োয়ালে তাঁদের পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা আছে। তাঁদের তোলা ফোটো দেশে ও বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই যোগ্যতা নিয়েই তাঁরা সিকিম পর্বতে ন'বার উঠেছেন ও নেমেছেন। একই পথ বেয়ে তিস্তার স্রোত ধরে ধরে উঠেছেন ও নেমেছেন। এই বইটিতে তাঁরা শুধু নামার কাহিনিই বলেছেন। কারণ, তিস্তার জন্ম থেকে তার নদী হয়ে উঠে ব্রহ্মপুত্রে বিলীন হওয়ার কাহিনিটাই তাঁরা বার বার তৈরি করে তুলতে চেয়েছেন।

বড় বড় পর্বতারোহীদের মধ্যেও এই দুই ধরনের আবেগ কাজ করে। এক পর্বতে দু'বার না যাওয়া, আবার একই পর্বতে বার বার যাওয়া। এভারেস্টের কোনও এক বার্ষিক উদ্‌যাপনে স্যার এডমন্ড হিলারিকে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। তিনি খানিকটা উঠে আর উঠলেন না। বললেন, শরীর টানছে না। অন্য দিকে, চিরকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী মেসনার প্রায় নেশাগ্রস্তের মতো একই শিখরে

কত জনজাতি তিস্তার সঙ্গে নিজেদের জীবন এক করে দিয়েছে। তিস্তা মাঝেমাঝেই বন্যায় ভাসায়— চরুয়ারা ভেসে আর এক চরে গিয়ে আবার জীবন শুরু করে।

আন্ড দ্য তিস্তা ফ্লোজ...। শমিতা চৌধুরী, উৎপল চৌধুরী। নিয়োগী বুকস, ১৪৯৫.০০

ফিরে ফিরে যেতে চান— নতুন পথে, নতুন উপায়ে।

শমিতা ও উৎপল চৌধুরীর প্রাথমিক টান হয়তো ছিল পাহাড়ে চড়া-ই। কিন্তু তাঁরা সেই প্রথম স্তরেই তিস্তাকে আবিষ্কার করে ফেলেন। এই বইটি তিস্তার সঙ্গে তাঁদের টান-ভালবাসার কাহিনি।

সাধারণ ভাবে ধরা হয়, তিস্তা ৎসো লামো জোড়া হ্রদ থেকেই বেরিয়েছে। শমিতা-উৎপল চৌধুরীও সেখান থেকেই তাঁদের তিস্তাবতরণ শুরু করেছেন। এটা ১৭,২১০ ফুট উঁচুতে— এর চাইতে উঁচুতে ভারতে কোনও হ্রদ নেই। জোড়া হ্রদ তো নেই-ই। এভারেস্টের প্রথম বেস ক্যাম্প বসানো হয় ১৬০০০ ফুটের একটু উপরে। ৎসো লামো তার চাইতে উঁচুতে। ৎসো লামো হ্রদের পুব দিকে পৌঁছলরি পর্বত। এই পর্বতের দিস্তাং খাংসে হিমবাহ থেকে উৎসারিত চাম্বু চু নদীরেখার সঙ্গে ৎসো লামো হ্রদ থেকে নিঃসারিত জল মিশে যায়। এই চাম্বু চু-কেই তিস্তার উৎস ধরা হয়। আমার মনে হয়, তিস্তা তার নাম পেয়েছে দিস্তাং হিমবাহ থেকে। শমিতা-উৎপল ফোটো দেখিয়ে দেখিয়ে আমাদের বলেছেন— ৎসো লামো হ্রদ থেকে একটু পশ্চিমে বাঁক নিয়ে তিস্তা ঢুকে পড়েছে গুরজামার হ্রদে। সেখানে গুরজামার চো আর থাংও চো-র সঙ্গে মিশে গেছে।

কিন্তু তিস্তা তো এক ভৌগোলিক নদী নয়— এ তো এক মানুষের নদী। তিব্বত থেকে সামান্য দূরে। তিস্তার অববাহিকার বিভিন্ন উচ্চতায় এক-এক জনজাতির বাস। ত্রয়োদশ শতকে তিব্বত থেকে এক জনগোষ্ঠী নেমে এসে লাচেন ও লাচুঙে নিজেদের গ্রাম তৈরি করে। আমাদের ভাষায় তাঁদের ভুটিয়া বলে। সাতশো বছরের ওপর তাঁরা তাঁদের এই বাসভূমিতে আছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তিস্তাকে নিয়ে। সাতশো বছরে জীবনযাপন, পোশাক-আশাক বদলেছে, কিন্তু তাঁদের সমাজ ও প্রশাসন একেবারেই তাঁদের নিজস্ব, ও সেই নিজস্বতা ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত। তিস্তা-বৌদ্ধধর্ম-কাঞ্চনজঙ্ঘা এই নিজস্বতার প্রধান আধার। বইটিতে সেই জীবনযাত্রার বিবরণ ছবির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। পশ্চিম হিমালয় নিয়ে এমন কাজ হয়েছে, কিন্তু পূর্ব হিমালয় নিয়ে এমন কাজ হয়েছে বলে তো জানি না— এক হুকার-এর 'হিমালয়ান জার্নাল' ছাড়া।

তিস্তা অববাহিকার আর এক জনজাতি লেপচা-রা। তাঁরাই নাকি সিকিমের আদিবাসী। দু'জোনও সেই এলাকার নাম। এই বইতেই প্রথম জানলাম— সাধারণ ভাবে উপেক্ষিত এই লেপচারা লোহা-পেরেক ছাড়া বিশেষ এক ধরনের বাড়ি তৈরিতে ও বেতের ঝোলানো সাঁকো বানাতে একক বিশেষজ্ঞ। সেই সচিত্র বিবরণ তিস্তাকে নতুন করে চেনায়— তিস্তার নিজস্ব জনজাতি কী ভাবে তিস্তার জীবনের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছেন। ওঁরা তিস্তা ধরে নেমে এসেছেন আরও নীচে, সমতলে। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহারে। পর্বতবাস ছেড়ে তিস্তা তখন অরণ্যবাসিনী। আর অরণ্যচর কত জনজাতি তিস্তার সঙ্গে নিজেদের জীবন এক করে দিয়েছে। তিস্তা তাদের নতুন-নতুন জীবিকা দিয়েছে। তিস্তা নিজের ভিতর থেকে তৈরি করে তুলেছে বড় বড় চর। সেই চরের জমি অত্যন্ত উর্বর ও নরম বলে সহজে চাষ করা যায়। তিস্তা মাঝেমাঝেই বন্যায় ভাসায়— চরুয়ারা ভেসে আর এক চরে গিয়ে আবার জীবন শুরু করে। নতুন জীবন নয়, সেই চিরকালীন তিস্তাজীবন। বন্যা যেমন নিয়ে যায় নতুন দেশে, তেমনই পুরনো নিয়মিত অতিথি হয়ে আসে বুনো হাতির পাল। শমিতা-উৎপল জানিয়েছেন, ফরেস্টের ভিতরের তিস্তার মানুষ হাতির পালের খাওয়ার জন্য আলাদা চাষ করে।

এমন সব অলৌকিক কাহিনি এ বইয়ে ঠাসা— ফোটোর প্রমাণ সহ।

লোকজীবনের এক নদীর ভিতর এমন অলৌকিককে তাঁরা খুঁজে পেলেন কেন? খুঁজলেনই-বা কেন?

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে শমিতা-উৎপল যখন পাহাড়ে-পাহাড়ে উঠছেন, ঘুরছেন, তখনই তাঁদের প্রথম সন্তান সম্ভাবনায় পাহাড়-পর্বতের ছায়ায়, পাহাড়ি নদীর শীকরকণায় নিজেদের ভেজাতে ভেজাতে ঠিক করেন যে, ছেলে হলে নাম রাখবেন রংগিত আর মেয়ে হলে তিস্তা। মেয়ে হল, তার নাম হল তিস্তা। তিস্তার যখন তেরো বছর বয়স, সে এনসেফেলাইটিসে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।

শমিতা-উৎপলের আর সন্তান হয়নি। তাঁরা তিস্তাকেই তাঁদের মেয়ে করে নিয়েছেন। তাই, সমতল থেকে শিখরে ওঠার কাহিনি তাঁরা লেখেন না। লিখেছেন তিস্তার সেই জন্ম, দিস্তাং হিমবাহ থেকে, আর তার নারী ও নদী হয়ে ওঠা ও পরিণত সেই তাঁদের কন্যার ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলনের কথা।

তিস্তা তাঁদের তিস্তার শোক-কে জীবন দিয়েছে।